দেড়শ কোটি টাকার ভোটার বাণিজ্য

অবশেষে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের আসল চেহারা জাতির সামনে প্রবলভাবে দেখা দিতে শুরু করেছে। বিরোধী দলের অভিযোগ মতো, এখন প্রমাণ হচ্ছে যে, তিনি কেবল বিএনপি-চারদলীয় জোটের লোকই নন, তার নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা প্রণয়নের নামে একটি দেড়শো কোটি টাকার অসৎ বাণিজ্যও করতে যাচ্ছে। দুর্নীতি ও অর্থ অপচয়ের ক্ষেত্রে এটি বাংলাদেশের চ্যাম্পিয়ন হবার এবং জোট সরকার ও তার দোসরদের দুর্নীতির আরো একটি মাইল ফলক হিসেবে গণ্য হতে যাচ্ছে। কোন নির্বাচন কমিশনারের সাথে আলোপ আলোচনা ছাড়াই এরই মাঝে নির্বাচন কমিশনের সচিব (বর্তমানে কমিশনার) ও বিএনপির আরো এক পরম দোসর স.ম. জাকারিয়ার সহায়তায় এই দেড়শো কোটি টাকার বাণিজ্য শুরুও হয়ে গেছে। ফরম ছাপা, ভোটার তালিকাভুক্তকরণ কর্মকর্তা নিয়োগ ইত্যাদি কাজ করা হয়ে গেছে এরই মাঝে। এছাড়াও ভোটার তালিকায় জালিয়াতি করার জন্য নির্বাচন কমিশনে ছাত্রদলের ক্যাডারদের নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে সরাসরি নিয়োগ দেবার কাজও সমাপ্ত হয়েছে। এসবের পর এখন প্রধান নির্বাচন কমিশনারের গ্রহণযোগ্যতা আরো কমে গেছে। প্রবল বিতর্কের মাঝে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব গ্রহণ করার পরপরই বিচারপতি আব্দুল আজিজ এককভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপের নামে যে বিভৎস প্রহসন করেন তাতেও তার গ্রহণযোগ্যতা কমে যায়। যদিও বিরোধী দল তাকে বিএনপির লোক বলে সরাসরি চিহ্নিত করেছে এবং তার প্রমাণও পাওয়া গেছে তবুও সাধারণ মানুষ তাকে তার কাজ দিয়েই মুল্যায়ন করতে চেয়েছিলো। এখন যখন তার কয়েকটি কাজের ফিরিস্তি প্রকাশিত হলো তাতেও বোঝা গেছে যে, তিনি কেবল যে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষক তাই নয়, তিনি অসৎ বাণিজ্যেরও রেকর্ড সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন। প্রায় দেড়শো কোটি টাকার ভোটার বাণিজ্য এখন তাই আরো একটি বৃহৎ কেলেঙ্কারীতে পরিণত হতে যাচ্ছে। অবশ্য একথাও ঠিক যে অতীতের আজিজ সাহেবরাও ধোয়া তুলসীপাতা নন। তাদেরও এর কাছাকাছি রেকর্ড রয়েছে।

এই প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনার মুন্সেফ আলী মন্তব্য করেছেন, “নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়ন মানেই রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয়। আইন বহির্ভূতভাবে প্রায় দেড়শ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন ভোটার তালিকা করার কোন যৌক্তিকতা নেই। এর চেয়ে অনেক কম খরচে নির্ভুলভাবে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা সম্ভব।” (পৃষ্ঠা ১৬, যুগান্তর ১৫ নভেম্বর ২০০৫) মুন্সেফ আলীর এই মন্তব্য থেকে এটি অত্যন্ত পরিষ্কার যে, দেড়শো কোটি টাকা দিয়ে যে নতুন ভোটার তালিকা করা হচ্ছে তার কোন

প্রয়োজন নেই। কিন্তু তবুও এই প্রয়োজন কেন তৈরী হলো-এই প্রশ্নের জবাবের সাথে আরো জবাব খোজা দরকার যে, সেটি আইনসিদ্ধ কিনা। নির্বাচন কমিশনার মুন্সেফ আলীর মতে নূতন ভোটার তালিকা করা আইনসিদ্ধও নয়। তার মতে, আইনেও তা বলা আছে। অনর্থক এই বিশাল বাজেটের অর্থ ব্যয় কার স্বার্থে তা দেখতে হবে। ......আগের তালিকাকে মূল ধরে নাম কর্তন বা সংযোজনের মাধ্যমে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার কথা আইনে বলা আছে। ভোটার রেজিস্ট্রেশন আইন ১৯৮২-এ এর স্পষ্ট উল্লেখ আছে। শুধু কোন নির্বাচনী এলাকায় বড় কোন অনিয়ম বা ভুল হলে সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র ওই এলাকার ভোটার তালিকা বাতিল করে নতুন তালিকা করা যেতে পারে। এখন যদি সারাদেশে নতুন তালিকা করতে হয় তবে আগের ভোটার তালিকা পুরোটাই বাতিল করতে হবে। আইনে কোথাও এর উল্লেখ নেই। (সূত্র ঐ)

এ প্রসঙ্গে পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে আরো জানা যায় যে, গত নির্বাচনে সাড়ে ৭ কোটি ভোটারের জন্য কয়েক কোটি টাকার বাড়তি ব্যয়ে কম্পিউটারাইজড ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়। এসময় এ ডাটাবেজকে ভিত্তি হিসেবে ধরে পরবর্তী ভোটার তালিকা করার কথা বলা হয়। এ ডাটাবেজ প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনার মুনসেফ আলী আরো বলেন, সারাদেশে ৮৩টি জেলা অফিসে নিজ নিজ জেলার ভোটারসহ এ ডাটাবেজ সংরক্ষিত আছে। নির্বাচনী কর্মকর্তাদের এ ডাটাবেজ বিষয়ে বিশেষ বিশেষ প্রশিক্ষণও দেয়া হয়েছে। এ ডাটাবেজ করে খুব কম খরচে ভোটার তালিকা করার সুযোগ কমিশনের সামনে রয়েছে। এতে তথ্য সংগ্রহকারীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে আগের ভোটার সংখ্যা এবং বর্তমান অবস্থা যাচাই করে দেখবে। নতুন ভোটারদের তালিকা করবে। মৃত বা স্থানান্তরিত ভোটারদের নাম বাদ দেবে। কোন ভোটারের নাম ভুল হলে বা ত্রুটি থাকলে সংশোধন করবে। এতে কোটি কোটি ভোটার ফরম বাঁচবে। সময় বাঁচবে। কোটি কোটি টাকার ভোটার তালিকা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পারিশ্রমিক বাঁচবে। তবুও নতুন ভোটার তালিকা কেন তা আমার বোধগম্য নয়।

এইসব বক্তব্য প্রকাশ করার পাশাপাশি একথাও বলা হয়েছে যে, নতুন ভোটার তালিকা সিইসির একক সিদ্ধান্তে প্রণীত হচ্ছে। দুনির্বাচন কমিশনার তালিকা হালনাগাদের পক্ষে। তাই এ তালিকা সিইসির, নির্বাচন কমিশনের নয়। ভবিষ্যতে এই একতরফা সিদ্ধান্ত প্রণীত তালিকা নিয়ে আইনি জটিলতার আশঙ্কা করছেন অনেকে। কিন্তু এতো কথা বলার পরও আজিজ মহাশয় পর্বতের মতো অটল আছেন। বিচারপতি হয়েও আইনের প্রতি সামান্য শ্রদ্ধা না দেখিয়েই তিনি এই জাতির দেড়শো কোটি টাকা অপচয় বা আত্মসাৎ করার সকল আয়োজন সম্পন্ন

করে চলেছেন। আমরা জানিনা, এই জাতি তাকে এজন্য বিচারপতি থেকে আসামীর কাঠগড়ায় দাড় করাবে কিনা? নিরপেক্ষ নির্বাচনতো দূরের কথা এই অসৎ ও বেআইনী কাজের জন্যই আগে আন্দোলন হওয়া দরকার।

আমাদের মূল আশঙ্কাটি বাণিজ্য সংক্রান্ত। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হচ্ছে ১৯৮৭ সালের পর থেকেই কম্পিউটারে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করার জন্য একটি প্রক্রিয়া বারবার নানা বাঁকে প্রবাহিত হয়ে শেষ পর্যন্ত একটি ডাটাবেজে রূপ নেয়। আমি স্মরণ করতে পারি, সেই ৮৭ সাল থেকেই আমরা বলে আসছিলাম যে, একই কাজ বারবার করার জন্য গরীব মানুষের ঘামের টাকা ব্যয় করার কোন প্রয়োজন নেই। সেই সময়কার প্রধান নির্বাচন কমিশনারগণ যথা, বিচারপতি রউফ সাহেব বা বিচারপতি নুরুল ইসলাম সাহেব কিংবা পরবর্তীকালের অতি বিতর্কিত সাইদ সাহেব সকলের আমলেই আমরা এই কথা বলে এসেছি। কিন্তু এদের অনেকেই আমাদের কথা শোনেননি। বরং একসময়ে ভোটার তালিকার সাথে ভোটার আইডি কার্ড প্রকল্প যোগ করে এই গরীব দেশের কোটি কোটি টাকার অপচয় বা আত্মসাত করা হয়েছে। এদের কোন জবাবদিহিতা নাই বলে এসব নিয়ে কেউ কোন তদন্তও করেনি। আমি জানিনা, চোখের সামনে আমাদের সকলের নাকের ডগায় এইসব দুর্ণীতি হলো, তবুও এইসব বিষয় নিয়ে কোন প্রশ্ন কেন তোলা হলোনা? আমি এটিও স্মরণ করতে পারি যে, কার্যত ভোটার তালিকা প্রস্তুত এবং সেটি মুদ্রণ নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা ও একশ্রেণীর অসৎ ব্যবসায়ীর একটি মওসুমী ব্যবসা। সেই ব্যবসায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার থেকে শুরু করে নির্বাচন কমিশনের পিয়ন দারোয়ান পর্যন্ত অংশ নেয়। তারা তাদের পাওনা বুঝে নিয়ে ব্যবসায়ীদেরকে লুটপাট করার সুযোগ দেয়।

বাংলায় ডাটাবেজ প্রস্তুত করে সেটি সংরক্ষণ করে তাকে পুনরায় ব্যবহার করার ব্যাপারটি ১৯৮৭ সালেই সম্ভব ছিলো। আমরা সেটি প্রমাণও করেছিলাম। তৎকালীন প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনার এবং তার সচিবের সামনে বারবার আমি নিজে এবং আমাদের বন্ধুরা এই কার্যক্রমের ডেমোও প্রদান করি। তখন অকারণে নানা প্রশ্ন তুলেছেন নির্বাচন কমিশনের কর্তারা। সেইসব প্রশ্নের বেশীরভাগই ছিলো অজ্ঞতাপ্রসূত। এর সাথে কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ নামক এক শ্রেণীর মানুষও জড়িত ছিলো। তারাও টাকার লোভে মিথ্যা ভাষ্য দিয়ে অসৎ নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করেছেন। মরহুম রুহুল আমিন সিদ্দিক বেচে থাকলে এইসব বিষয়ে চাক্ষুষ প্রমাণের কথা তিনি বলতে পারতেন। আমি এটিও স্মরণ করতে পারি যে, কম্পিউটারে ভোটার তালিকা মুদ্রণের সিদ্ধান্ত হবার পর সেটি যাতে ডাটাবেজ আকারে না হতে পারে তার চেষ্টাও কম করা হয়নি।

এখন বুঝতে পারছি যে, কম্পিউটারে ভোটার ডাটাবেজ প্রস্তুত করাতে নির্বাচন কমিশনের কর্তাদের কি বিপুল পরিমাণের ক্ষতি হয়ে থাকে। তারা এর মাধ্যমে যে বিপুল পরিমান টাকা কামাই করে তা বন্ধ করতে দিতে তারা ইচ্ছুক নয়। বাংলাদেশে সরকারী অফিসে কম্পিউটারের প্রবেশকে যে প্রতিরোধ করা হচ্ছে তার অন্যতম কারণ হচ্ছে দুর্ণীতি। সেই দুর্ণীতিরই অংশ হচ্ছে ভোটার তালিকাকে ডাটাবেজে রূপান্তর না করতে দেয়া।

শেষ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনার মুন্সেফ আলীর মতে ভোটার তালিকা ডাটাবেজে রূপান্তরিত হয়েছে। সেজন্যও বিপুল টাকা ব্যয় করা হয়েছে। তখন বলা হয়েছে যে, এই ডাটাবেজ করার ফলে রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয় বন্ধ হবে।

এটি সত্য যে, ভোটার তালিকার ডাটাবেজকে একটি স্থায়ী রূপ দেয়া সম্ভব। এতে হয়তো কিছু কিছু কারিগরি ত্রুটি আছে। কারণ যারা এই ডাটাবেজের কারিগরি পরামর্শ দিয়েছেন তাদের কাছে আমি এটি আশা করিনা যে, তারা ইউনিকোড বা বিডিএস ১৫২০:২০০০ এনকোডিং পদ্ধতিতে একটি আধুনিক ও সর্বোৎকৃষ্ট সর্টেবল ডাটাবেজ তৈরী করেছেন। তারা হয়তো যে আসকি কোডের ডাটা দিয়ে (সম্ভবত বিজয়) ভোটার তালিকা মুদ্রণ করা হয়েছে তাকেই সংরক্ষণ করেছেন। এটি পুরোপুরি সঠিক না হলেও মন্দের ভালো। কারণ এর ফলে বিদ্যমান ভোটারদের ডাটা আবার এন্ট্রি করার প্রয়োজন হবেনা। নির্বাচন কমিশনার মুন্সেফ আলীর মতামত অনুযায়ী ভোটার তালিকাটি সংশোধন বা হাল নাগাদ করে বিদ্যমান ডাটাকেই কাজে লাগানো যেতে পারে। এতে হয়তো শতকরা ১০/২০ ভাগ নতুন ডাটা যোগ করতে হবে।

তবে আমি মনে করি, এটিকে একটি জাতীয় ডাটাবেজে রূপান্তর করা যায়। বিদ্যমান ডাটাকে বিজয় একুশে দিয়ে ইউনিকোড পদ্ধতিতে রূপান্তর করে একে সর্টেবল ডাটাবেজে রূপান্তর করা যায়। এটিকে সুতন্বীওএমজে বা এই জাতীয় ওপেন টাইপ ফন্টে ইন্টারনেটে প্রকাশ করা যায় এবং সারা দুনিয়া থেকেই এই ভোটার তালিকা দেখতে পাবার সুবিধাও করা যায়। একটি কেন্দ্রিয় সার্ভারে এই ডাটাগুলো রেখে সেটিকে সারাদেশের নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় নেয়া যায়। এর ফলে জলিয়াতি করে ভোটদান বা ভোট ডাকাতির সুযোগ কমে যাবে। এর ফলে এমনকি ইন্টারনেটে ভোট দানের ব্যবস্থাও করা যাবে। এজন্য কিছু সামান্য টাকা হয়তো ব্যয় করতে হবে। কিন্তু সেটি না করে দেড়শো কোটি টাকা অপচয় করার যে মহাযজ্ঞ জনাব আজিজ সাহেব করছেন তার জন্য পনেরো কোটি মানুষের কাঠগড়ায় অভিযুক্ত আসামী হিসেবে তাকে দাড় করানো উচিত। আমাদের সকলের চোখের সামনে গরীব মানুষের টাকা এভাবে নষ্ট এবং আত্মসাত করতে

দেয়া যায়না। এদেশে দিনে ৫০ টাকা কামাই করার জন্য মানুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। মঙ্গায় মানুষ মরে। খাবারের জন্য আত্মাহুতি দেয় দিপালীরা। সেই দেশে দেড়শো কোটি টাকা লুটে নেয়া হবে বা পানিতে ফেলে দেয়া হবে সেটি চলতে দেয়া যায়না। আমি আশা করি, আমাদের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো, সুশীল সমাজ ও সচেতন মানুষ আব্দুল আজিজ নামক তোঘলককে এই মহা অন্যায় করা থেকে বিরত রাখতে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলবেন।

২৩ নভেম্বর ২০০৫॥ ০৬ ফেব্রুয়ারি ০৬ সম্পাদিত